হাসির গল্প সমগ্র

সম্পাদনা বিজিত ঘোষ

প্রথম খণ্ড

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

- কলিকাতা কমলালয় ১৭
- নববাবুবিলাস ৪৫
- নববিবিবিলাস ৬৭

রামনারায়ণ তর্করত্ন

- কুলীন কুলসর্ব্বস্ব ১১৫
- নব-নাটক ১৮১
- যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ২৪১
- চক্ষুদান ২৬৩
- উভয় সঙ্কট ২৭৫

মধুসূদন দত্ত

- একেই কি বলে সভ্যতা ? ২৯৫
- বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ ৩১৫

দীনবন্ধু মিত্র

- বিয়েপাগলা বুড়ো ৩৪১
- সধবার একাদশী ৩৭৯
- জামাই বারিক ৪৪১

নারায়ণপুর গ্রামের উখড়া পরগনায় ১১৯৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ভবানীচরণের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ভবানীচরণ সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে জুরি নিযুক্ত হন। তবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে ভবানীচরণ রামমোহনের সঙ্গে যুক্তভাবে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এর ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ কলুটোলায় নিজে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি একাই 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের শক্তিশালী মুখপত্ররূপে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এটি সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার সম্পাদক হন ভবানীচরণ। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নায়ক হিসেবে সেকালে সামাজিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। গৌড়ীয় সমাজের সদস্যরূপে বাংলাভাষার উন্নতির জন্য কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকেরও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তিনি। বাংলার পাশাপাশি পারসি ও ইংরেজি ভাষাতেও যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন ভবানীচরণ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সেকালের জনপ্রিয় ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশাগুলিকে অনেকেই বাংলা প্রহসনের পূর্বাভাস বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আসলে সমস্ত ক্ষেত্রেই সূচনারও আগে একটা আরম্ভ থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাকে বলতে পারি, 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো।'

এটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে আদৌ কম মূল্যবান ব্যাপার নয়। বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে সেই 'সলতে পাকানোর কাজ'টি প্রথম করে গেছেন শ্রী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'নববিবি বিলাস' (১৮৩০) প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশাগুলির মধ্য দিয়ে।

ভবানীচরণ সংস্কৃতানুযায়ী বাংলা গদ্যরীতির সমর্থক ছিলেন। যাবনিক শব্দের বদলে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারেই তিনি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে ৮২টি যবনিকা শব্দ ও তার একাধিক দেশি প্রতিবেশীদের তালিকা দেন। যেসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হয় না, সেগুলিকে হুবহু বাংলা ভাষায় গ্রহণ করাই উচিত বলে তাঁর অভিমত। সে ধরনের গ্রহণযোগ্য বিদেশি শব্দ সংখ্যা ছিল ১৩০টি।

'কলিকাতা কমলালয়' আসলে 'প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা কলিকাতার রীতিবর্ণনা'। এটি একটি নকশা জাতীয় রচনা। 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থটির মধ্যে গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াসকে। 'দূতী বিলাস' পয়ারাদি ছন্দে রচিত কুটিনী প্রসঙ্গ। 'নববিবি বিলাস'-এ উচ্ছৃঙ্খল রমণীর জীবন ও পরিণতির কাহিনিকে গল্প ও নকশার মিশ্র রীতিতে পরিবেশন করা হয়েছে।

এই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে সমকালে ভবানীচরণ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন; বিশেষত ব্যঙ্গারস পরিবেশনের ক্ষেত্রে।

সেই প্রসঙ্গে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : 'তাঁহারই স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরস তরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি বাঙালীকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন, পথভ্রান্ত বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাঁহার রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই।'

'**কলিকাতা কমলালয়**' গ্রন্থে হিন্দু সমাজের 'বাবু' সম্প্রদায়ের অন্তঃসারশূন্যতাকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন ভবানীচরণ। আসলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে তখন যুবসমাজে দেখা দিচ্ছিল উৎকেন্দ্রিকতা। সেই অনিবার্য ভাঙনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ভবানীচরণ।

'**নববাবুবিলাস**'-এও তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-য় লিখেছেন ঃ 'হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার ব্যবহারের ত্রুটি প্রতিপাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।'

এগুলি ছাড়াও '**দূতীবিলাস**' (১৮২৫), '**নববিবিবিলাস**' ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশাগুলির মধ্য দিয়েও ভবানীচরণ তদানীন্তন কলকাতা সমাজের দুর্নীতির মুখোশ সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছেন।

কেবল বাংলা প্রহসনের পূর্বাভাস হিসেবেই নয়, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে প্রকাশিত ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক কাহিনি বা উপাখ্যানরূপেও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। পাদরি জেমস লঙ-এর ক্যাটালগ অনুযায়ী অবশ্য এটির প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ।

কলকাতার সমাজজীবন নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম লেখনী ধরেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এরপর কলকাতাকে বিষয় করে একটি উপন্যাস লেখা হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত তার নাম ছিল ' লাইফ ইন ইন্ডিয়া অব দ্য ইংলিশ ইন ক্যালকাটা'।

'নববাবুবিলাস'-এর পর লেখা হল 'কলিকাতা কমলালয়'। এ তথ্য পাওয়া যায় ভবানীচরণের 'জীবন চরিত'-এ। 'তিনি আত্মীয়বর্গের অনুরোধে গদ্যপদ্য রচনায় প্রথমত নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচনা করেন ঐ পুস্তক সাধারণের কৌতুকজনক ফলত তদ্দ্বারা কৌশলে এতন্নগরীয় ভাগ্যবান সন্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তদ্দৃষ্টে কুকার্য পরিহার করিয়া সৎপথাবলম্বন করেন। তদনন্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় বিকাশ করিলেন...।'

১৮৩১ এর ১ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এক পত্রপ্রেরক লিখেছিলেন—

'শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু — ....এক্ষণে নূতন বাবুরদিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্তেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী অবোধ পল্লীগ্রামবাসির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি পত্নীর কুক্রিয়া ভয় ও লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কৃপাতে উদ্ধার হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতীবিলাস গ্রন্থ অপূর্ব উপদেশে উক্ত দোষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিতেছেন...।' ৫ ভাদ্র ১২৩৮ সাল — শ্রীম, বি,।

'**নববাবুবিলাস**' যে একটি উচ্চাঙ্গের ব্যঙ্গচিত্র, তা অনেক সমালোচকই স্বীকার করেছেন। ১৮৫৫-তে পাদরি লং সাহেব লিখেছিলেন, "One of the ablest satires on the Calcutta

Babu, as he was 30 years ago." 'নববাবুবিলাস' প্রশংসিত হয়েছিল সমকালের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'তেও ঃ

'It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as well as its allusions and similes are purely native, and this imparts a value to it superior to that which could be attached to a similar representation from a European pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical, and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however, is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other; its episodes are occasionally dull and languid, and its poetry often inharmonious as well as prosing; but with all its defects, it is a valuable document; it illustrates the habits and economy of rich natlve families, and affords us a glance behind the scenes. — "The amusements of the Modern Baboo. A work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825". The Friend of India (Quarterly Series), October 1825, p. 289.

এইসব নানাবিধ গুণের জন্য 'নববাবুবিলাস' সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত গ্রন্থটির অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৫৭-র ১১ই জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি :

'বিদ্যাভূনীকৃত বাবুনাটক'। — কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য দ্বারা বিরচিত হইবার এইক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্তমান প্রচলিত নিয়ম মতো নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।. আনা,...।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি শুধুমাত্র একটি নকশা জাতীয় রচনাই নয়; পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের সার্থক প্রহসনগুলির পূর্বাভাস 'নববাবুবিলাস'। আবার উপন্যাসের জন্ম-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ভবানীচরণের এই রচনাটিকে অস্বীকার করা যাবে না। 'নববাবুবিলাস' বাংলা উপন্যাসের বিকাশপথে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা নিঃসন্দেহে ('নববাবুবিলাস ভাবী উপন্যাসের পূর্বাভাস')।

তেমনি ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস'-কেও কেবলমাত্র সামাজিক ব্যঙ্গ-নকশা অভিধায় ভূষিত করাই যথেষ্ট নয়; এখানে প্রধান প্রধান নারী চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় রেখে গেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবার উপরে, সমকালীন কলকাতার চিত্ররূপে ভবানীচরণের তিনটি গ্রন্থের (স্বনামে 'কলিকাতা কমলালয়' এবং প্রমথনাথ শর্মন ছদ্মনামে 'নববাবুবিলাস' ও ভোলানাথ বন্দ্যোঃ ছদ্মনামে 'নববিবিবিলাস') গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

সামাজিক নকশা রচনাতে খ্যাতিমান ভবানীচরণ সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার কাজেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

হাসির গল্প পঞ্চাশজন

সম্পাদনা বিজিত ঘোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কালীপ্রসন্ন সিংহ

- হুতোম প্যাঁচার নক্সা ৪৯৯

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

- য্যায়সা-কা-ত্যায়সা ৬১৭
- বেল্লিক-বাজার ৬৫৭
- সভ্যতার পাণ্ডা ৬৮১
- সপ্তমীতে বিসর্জ্জন ৭১১
- বড়দিনের বখশিস ৭৩১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

- কিঞ্চিৎ জলযোগ ৭৫৯
- অলীকবাবু ৭৮৩
- হঠাৎ নবাব ৮২৫
- হিতে বিপরীত ৮৮১
- দায়ে প'ড়ে দার গ্রহ ৮৯৩

অমৃতলাল বসু

- বিবাহ-বিভ্রাট ৯২৭
- চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ৯৬৫
- তাজ্জব ব্যাপার ৯৮৫
- কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র-যাত্রা ১০০৩
- বৌমা ১০৩৩

কলকাতার জোড়াসাঁকো নিবাসী ধনী জমিদার নন্দলাল সিংহের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হয় ১৮৪০-এ। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন কালীপ্রসন্ন। মাত্র ছ'বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। ত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু নিয়েও ভাষা সাহিত্যে এবং সমাজ জীবনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন কালীপ্রসন্ন।

অল্পবয়স থেকেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি একটি সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তা 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩) নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে এই সভা, এই নামের রঙ্গামঞ্চ (১৮৫৬) ও পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা (১৮৫৫), 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' (১৮৫৬), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৬১) প্রভৃতি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকাগুলি ছাড়াও 'পরিদর্শক' (১৮৬১) নামের একটি দৈনিক সংবাদপত্রও সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন। ১৮৫৬-তে রামনারায়ণ অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করে বিশেষ সুনামের অধিকারী হন তিনি।

একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা কালীপ্রসন্ন শুধুমাত্র 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২ ও ১৮৬৪) ও গদ্যে অনূদিত 'পুরাণ সংগ্রহ' (১৮৬০-৬৬) নামে অষ্টাদশ পর্বের মহাভারতের (সমগ্র এবং অ-সংক্ষেপিত) জন্যই অমর হয়ে আছেন। এছাড়াও তিনি 'বাবু' নাটক (১৮৫৪), কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুবাদ (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) নাটক, ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের (১৮৫৯) অনুবাদ ও 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-র অনুবাদ (১৮৬২) করেছিলেন।

দেশের বহুবিধ হিতকর কাজে তিনি দু'হাতে দান করেছেন। তিনি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন বিধবা-বিবাহে পুরুষদের উৎসাহী করতে। দান করেছেন দুর্ভিক্ষে, লেখকদের গ্রন্থ ছাপায়, একাধিক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে। অসংখ্য দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাহায্য করতেন কালীপ্রসন্ন। ছাত্রদের বাংলা রচনায় উৎসাহিত করার জন্য তিনি পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'মেঘনাদবধকাব্য' (১৮৬১) রচনার পর তিনিই প্রথম মধুসূদনকে সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করেন। দিনটি ছিল ১৮৬১-র ১২ ফেব্রুয়ারি।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য পাদরি লঙ্ সাহেবের জরিমানার হাজার টাকা আদালতে জমা দিয়েছিলেন শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহই। বিধবা বিবাহকে জনপ্রিয় করে তুলবার সমস্ত প্রচেষ্টার পাশাপাশি তিনি চেষ্টা করেছিলেন বহুবিবাহ রোধের। তার ছোটো জীবনসীমায় অসংখ্য মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করে গেছেন কালীপ্রসন্ন। রিচার্ডসন, লঙ্সাহেব, 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন'-এর শম্ভুচন্দ্র, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখার্জি ও তাঁর পরিবার এবং আরও অনেককেই নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন এই দরদি মানুষটি।

বঙ্গভাষার লেখকদের অর্থ দিয়ে, উৎসাহ-প্রেরণা-সম্মান-সংবর্ধনা জানিয়ে, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও অকাতরে দান করে গেছেন কালীপ্রসন্ন। সেকালের সুখবিলাসে অভ্যস্ত ধনীর সন্তানদের মধ্যে তিনি এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

মাত্র ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন কালীপ্রসন্ন। এই স্বল্প সময়েই আশ্চর্য প্রতিভাবলে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মনীষী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট জন হয়ে ওঠেন। আত্মত্যাগী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এমন মহানুভব উদার মহৎ মানুষ জগতে খুব কমই জন্মেছেন। ১৮৭০-এর ২৪ জুলাই এই মহামানবের মৃত্যু ঘটে।

হুতোম প্যাঁচার নকশা

প্রথম 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। সেটি ছিল একটি ১৬ পৃষ্ঠার চটি বই। তার নাম ছিল 'হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নকশা'। দাম লেখা ছিল 'পয়শায় দুখানা'। সেই বইতে 'চড়ক' নামে একটিমাত্র নকশা ছিল। পরে তাতে আরও নকশা যোগ করে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা/প্রথম ভাগ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৩-তে। ১৮৬৪-তে দু'ই ভাগ একত্রে প্রকাশ পায়। তারপর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র অজস্র পুনর্মুদ্রিত ও সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ইংরেজি নাম 'Sketches by Hootum illustrative of Everyday life and Every day People'।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২-১৮৬৪) তৎকালীন সমাজজীবনের চমৎকার ব্যঙ্গারূপ। সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দবহুল পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে কথ্যভাষার প্রচলনে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

গবেষক-অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, '' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' নক্‌শাজাতীয় রচনা। লেখক সমকালীন কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উপরে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন।... এই গ্রন্থে গদ্য ভাষারীতিতে কালীপ্রসন্ন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। বইটি আদ্যন্ত চলিত ভাষায় রচিত। কলকাতার কথ্যভাষাকে অবিকৃতভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে স্থান দিলেন।...বিংশ শতক শুরু হবার প্রায় চল্লিশ বছর আগে কালীপ্রসন্ন গদ্যরীতির ক্ষেত্রে পরবর্তী শতকের জন্য মহামূল্য ঐতিহ্য রেখে গেলেন।...নক্‌শাগুলিতে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গহাস্য চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।...হুতোমের ভাষা চিত্ররচনায় নিপুণ। এ চিত্র বর্ণবহুল, — তার মধ্যে বাইরের এবং লেখকের মনের দুরকম বর্ণ-ই মিলবে। সে চিত্র গতিময়। বইটি যেন বর্ণাঢ্য ভাষার চলচ্চিত্র। কোথাও কোথাও ব্যঙ্গাদৃষ্টি পরিহার করে স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে চমৎকার রস রচনার জন্ম দিয়েছেন হুতোম।'

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র ঐতিহাসিক মূল্য কেবল চলতি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ হিসেবেই নয়; তেমন জীবন্ত, বাস্তব সামাজিক ছবিও বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম।

কালীপ্রসন্ন সিংহের আগে-পরে নকশা রচনা করেছেন অনেকেই। নকশা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলা যেতে পারে 'বাবুর উপাখ্যান'-কে। এই রচনাটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। আরও দু'বছর পর ১৮২৩ ও ১৮২৫-এ আমরা পেয়েছি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাস'। তা সত্ত্বেও 'হুতোম

প্যাঁচার নকশা'-র অনন্যতা অনস্বীকার্য।

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র প্রতিটি প্রধান চরিত্রই বাস্তব। সমসাময়িক ঘটনাবলি ও তার প্রতিক্রিয়া সমূহও নিতান্ত বাস্তব। অন্য কোনো নকশায় এমনটি লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া কালীপ্রসন্নের নকশার মতো স্বচ্ছ চলিত ভাষা অন্যত্র দুর্লভ। যাবতীয় ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণে ও প্রতিটি চরিত্রের প্রতি অনন্ত মনোযোগ ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের সমকক্ষ নকশা রচয়িতা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ আসেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের ভাষা সম্পর্কে প্রসন্ন না হয়েও স্বীকার করেছিলেন, 'Hutum was one of the most sucessful writers in the style first introduced be Tekchand.' (Calcutta Review, 1871)। স্বয়ং কালীপ্রসন্নের এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলিষ্ঠ সাহসী সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল এইরকম : 'এই নক্সায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার হয় নাই।'

এ-প্রসঙ্গে পরিশ্রমী গবেষক শ্রী অরুণ নাগ যথার্থই বলেছেন : 'হুতোমের রচনার গুণ গাওয়া বৃথা। যে রচনা কমবেশি সোয়াশ (এখন প্রায় দেড়শো) বছর ধরে তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে, কালের দুরূহ, অন্তিম পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ, তার প্রশস্তির প্রয়োজন হয় না।'

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সমকালের একটি অসামান্য সামাজিক দলিল হয়ে আছে। চড়ক পার্বণের রঙ্গ, বারোয়ারির নেপথ্যে সামাজিক ব্যভিচার, ছেলেধরা, বিচিত্র হুজুগের ব্যঙ্গ, হঠাৎ অবতারবাবু পদ্মলোচন, রাসলীলা উৎসব, মহেশের স্নানযাত্রার বিবরণকে অনবদ্য দক্ষতায় নিখুঁত শিল্পীর নিপুণ তুলির টানে বিশ্বস্ত করে এঁকেছেন কালীপ্রসন্ন।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ '১৮৬২ সালে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়নি, তখন কলকাতার চলতি বুলি অবলম্বন করে এরকম ব্যঙ্গাবিদ্রূপে পূর্ণ অতিশয় শক্তিশালী প্রয়াস বাস্তবিক বিস্ময়কর। কালীপ্রসন্ন দেখেছিলেন, তৎকালীন কলকাতার বদ সহবত শোধরাতে এ ধরনের ঝাঁঝালো ভাষা চাই। তাই তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় অবিকল শহুরে চলতি কথা ব্যবহার করেছেন।'

তৎকালীন সমাজের বিশ্বস্ত ছবিতে মুগ্ধ হয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্পর্কে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদমায়েশের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চমকে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম।'

এই নকশায় কালীপ্রসন্নের ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'আজব শহর কলকেতার' 'হঠাৎবাবু' গোষ্ঠী। হুতোমের ভাষার শানিত বিদ্রূপ-বাণে চলতি ভাষা পেয়েছে এক অনন্যসাধারণ মাত্রা। চলিত গদ্যের এমন ঝকঝকে রূপ, এমন গতিশীলতা সেকালের আর কোনো রচনায় দেখা যায় না। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কালীপ্রসন্নই প্রথম আবিষ্কার করলেন চলিত গদ্যের শক্তি।

উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ; বিশেষ করে কলকাতা ও বাঙালিয়ানা নিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে যে ভাষা উঠে এসেছে, তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে নিছক স্থির বাস্তবচিত্র নয়, তাতে মিশেছে কালীপ্রসন্নের অনবদ্য সাহিত্যিক মুনশিয়ানা; যা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-কে কালজয়ী নির্মাণ করে তুলেছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে। বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি ক'রে খ্যালা করে, তেম্নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাক্তো, তা হ'লে স্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা-নাবুদ হতে পেতো না— তা হলে হয়ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাক্তেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে, আমরা তাতেই লাগি— সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেছেন— বেশীর ভাগ অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্সাই অবলম্বন হয়ে পড়্লো। কথায় বলে, এক জন বড়মানুষ, তাঁর প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখাবার জন্য, এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন; সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাকদিন আর সে নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না; শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা-মুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত। বড়মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকা-মুটের ওপোর ব'সে আসতে দ্যাখে বল্লেন,— "ভাঁড়, এ কি হে?" ভাঁড় বল্লে, "ধর্ম্মাবতার! আজকের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্সাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে 'এই এক নতুন' বলে দাঁড়ালেন— এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্সা প্রচারিত হলো, নক্সাখানির দু পাত দেখ্লেই স্বহৃদয়মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন; কারণ, আমি এই নক্সায় একটি কথাও অলীক বা অমূলক ব্যবহার করি নাই। সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্সার মধ্যে থাক্তে ভুলি নাই।

নক্সাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম; কারণ, পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফ্যালেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায়, তারই তদ্বির করে থাকেন। কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে— ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না; সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো— পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাপ কর্বেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা।

হাসির গল্প পঞ্চাশটি

সম্পাদনা বিজিত ঘোষ

তৃতীয় খণ্ড

পুনশ্চ

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- শেষ রক্ষা ১০৯৯
- বৈকুণ্ঠের খাতা ১১৫৭
- চিরকুমার সভা ১১৮১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

- সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার ১৩০৫
- বিরহ ১৩৮৩
- ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার ১৪৪৩
- প্রায়শ্চিত্ত ১৫০১
- পুনর্জন্ম ১৫৪৯

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১-র ৭ মে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মাতা সারদা দেবী। মাত্র ১২ বছর বয়সেই (১৮৭৩) রবীন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামের একটি নাটক রচনা করেন। আর ১৩ বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ পায় (১৮৭৪) 'অভিলাষ' নামের একটি সুন্দর কবিতা।

ছাপার অক্ষরে স্বনামে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' (৩০.১০.১২৮১ বঙ্গাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায়, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' শিরোনামে। এছাড়া 'ভারতী' (১৮৭৭) ও 'বালক' (১৮৮৫) পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। 'ভারতী'-র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটোগল্প ('ভিখারিণী') ও প্রথম উপন্যাস ('করুণা') প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশের পর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি জয়মাল্য লাভ করেন।

এছাড়াও 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রভৃতি পরিণত গ্রন্থসমূহ তিনি কিশোর বয়সেই লিখে ফেলেন। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ পদচারণা করেননি। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, কবিতা, সংগীত, বিচিত্র ধরনের প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। ১৯১৩-তে 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ('song of ferings') জন্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান।

চারখণ্ডে সমাপ্ত 'গল্পগুচ্ছ'-এর অসংখ্য গল্প, 'গীতবিতান'-এর দুই সহস্রাধিক সংগীত, অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধ গ্রন্থ, অনেকগুলি উপন্যাস ('চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরেবাইরে' প্রভৃতি) ও নাটকের ('রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি) মধ্যে তিনি অমর হয়ে আছেন দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর অন্তরে। প্রহসন-রচয়িতা হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন।

সম্পাদক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। ১৮৯৮-তে 'ভারতী', ১৯০১-এ 'বঙ্গদর্শন' ও ১৯১১-তে 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন তিনি। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'মানময়ী'তে মদনের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি।

বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পাত্রী ছিলেন তাঁদের জমিদারি সেরেস্তার এক কর্মচারীর এগারো বছরের কন্যা। নাম ভবতারিণী (পরিবর্তিত নাম মৃণালিনী)। দিনটা ছিল ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথ বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম নির্মাণ করেন ('বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়)।

সাহিত্যক্ষেত্রে বহুমুখী প্রতিভায় উজ্জ্বলতম এই মানুষটি মস্ত বড়ো দেশসেবকও ছিলেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য তিনি রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেন। পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় স্বদেশবাসীর উপর ও' ডায়ারের নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ প্রদত্ত বিশেষ সম্মান 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন (১৯১৯-এর ২৯শে এপ্রিল)। 'বিশ্বভারতী' নামে সমগ্র বিশ্বের এক মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলেন তিনি শান্তিনিকেতনে। তাঁর রচিত দু'টি গান ('জনগণমন অধিনায়ক' ও 'আমার সোনার বাঙলা') দু'ই দেশের (ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ) জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

উপাধিও তিনি কম পাননি। ১৯১৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫-এ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬-এ, এবং ১৯৪০-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি.লিট. উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯২৪-এ চিন দেশ 'বজ্রপ্রভাত', ১৯৩১-এ সংস্কৃত কলেজ 'কবি সার্বভৌম'; ১৯৩৯ ও ৪১-এ পুরী ও ত্রিপুরার রাজা রবীন্দ্রনাথকে 'পরমগুরু' ও 'ভারতভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩২-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে সম্মানিত করেন।

এই মহামানবের শারীরিক মৃত্যুই (১৯৪১-এর ৭ আগস্ট) ঘটেছে মাত্র। আসলে তিনি তাঁর বিবিধ সৃষ্টিসম্ভারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রতিক্ষণ জীবিত।

কৈশোরকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাতেও হাতেখড়ি। সে-সময়ে ও পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ কিছু কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য এবং গীতিনাট্য নির্মাণ করেন। সেগুলির মধ্যে আছে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০) ইত্যাদি। চিত্রাঙ্গদার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন তার দৈহিক রূপসর্বস্ব প্রেম ও যথার্থ ভালোবাসার দ্বন্দ্বকে।

এরপর প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করে একের পর এক অসামান্য সব নাটক লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'মুকুট' (১৯০৮), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) ইত্যাদি।

প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের সংঘাত দেখানো হয়েছে 'বিসর্জন' নাটকে। পরিশেষে প্রথা-সংস্কার পরাভূত হয়ে প্রেমেরই জয়লাভ ঘটেছে। 'মালিনী'র বিষয়ও অনেকটা অনুরূপ। 'নটীর পূজা' নির্মিত হয়েছিল বৌদ্ধ যুগের আত্মত্যাগের কাহিনি অবলম্বনে।

রূপক ও সাংকেতিক তত্ত্বনাটক রচনার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯৩৫), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিক্ষেত্রেই দুই দল বা গোষ্ঠীর সংঘাতই নাটকগুলির মূল বিষয় হয়ে ওঠে। 'মুক্তধারা'-য় দেখি সাম্রাজ্যবাদী উত্তরকূটবাসী ও কৃষিজীবী শিবতরাইবাসী — এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে।

'রাজা' নাটকে দেখি রূপের সঙ্গে অরূপের দ্বন্দ্ব। 'তাসের দেশ'-এ তাসের দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত রাজকুমারের বেঁধেছে দ্বন্দ্ব। 'অচলায়তন'-ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে একদল চায় মন্ত্রতন্ত্র-আচার ও বিধিনিষেধের দৃঢ় বন্ধনে জীবনকে বেঁধে রাখতে। আর একদল চায় এই গতিহীন অচলাবস্থাকে ভেঙে জীবনকে চলমান করতে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব বা রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মূল আলোচ্য বিষয় এই দ্বন্দ্ব। এই দুই দ্বন্দ্বসৃষ্টিকারী দলের মধ্যে অনেক সময় একজন বিরুদ্ধ দলে যোগ দেন মানবতার স্বার্থে। যেমন 'মুক্তধারা' নাটকের অভিজিৎ। সে উত্তরকূটের রাজপুত্র হয়েও অত্যাচারিত, নিপীড়িত শিবতরাইবাসীদের পক্ষ নেয়। তাদের প্রাণ বাঁচাতে তথা নিজের গোষ্ঠীর অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে প্রাণও বিসর্জন দেয় অভিজিৎ। তার মৃত্যু হলেও জয় হয়েছে ন্যায়নীতির। জয় হয়েছে মানবতার। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে হয়ে উঠেছে মহামৃত্যুঞ্জয়। তার মৃত্যুতে চেতনা জাগ্রত হয়েছে অত্যাচারী দলের প্রতিভূ রাজা রণজিতের। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকে মৃত্যু তাই কোনো শোকাবহ ঘটনা নয়। যে-কারণে দেখি 'রক্তকরবী'-তে রঞ্জনের মৃত্যু রাজার চেতনা জাগিয়েছে। নন্দিনীর মৃত্যু বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছে বিশুর মাধ্যমে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের বহুগ্রাসী সংগ্রহশীলতা মানুষ ও তার পরিবেশকে কেমন যান্ত্রিক করে তোলে, অবশেষে অনাবিল প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠায় সেই যান্ত্রিকতার অবসান ঘটে, — 'রক্তকরবী' নাটকের মাধ্যমে সেই তত্ত্বই প্রকাশ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর প্রায় সব রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদের মূল বিষয় মানুষের অন্তরতম সত্তার অবরোধ ও বিকৃতি আর তার থেকে মুক্তি।

যক্ষপুরীর রাজার অন্তরসত্তার বিকৃতির কারণ তার অপরিমেয় ধনলোভ, প্রচণ্ড জড়শক্তির দম্ভ ও যান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। এই যান্ত্রিকতার জালে আবদ্ধ বিকৃত-সত্তা রাজার মুক্তি আনে নন্দিনী। নন্দিনী প্রাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্দি মানবাত্মার ব্যথিত চিত্তের দীর্ঘশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে বারবার ব্যথিয়ে তুলেছে। 'মুক্তধারা' তেমনই এক অসামান্য সৃষ্টি। ১৩৩০ সালে 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' একত্রে 'প্রবাসী'তে 'রথযাত্রা' নামে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটির মূল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে। তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।'

এই নাটক রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়েওছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেকগ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধ অসত্য। এতকাল যাদের পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

'ডাকঘর'-ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংকেতিক নাটক। তত্ত্বকথা বাদ দিলেও এটি বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে বিবেচিত হতে পারে।

'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯) নামের নৃত্যনাট্যগুলিও যথেষ্টই উচ্চমানের। বলাবাহুল্য, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথও কালোত্তীর্ণ অনন্য প্রতিভারই অধিকারী।

স্নিগ্ধ হাস্য-কৌতুকে উজ্জ্বল কয়েকটি অনবদ্য রঙ্গ-প্রহসনও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে সেগুলি এক স্মরণীয় সৃষ্টি। সেই উল্লেখযোগ্য রঙ্গনাট্যগুলি হল ঃ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) ইত্যাদি।

প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আগে অনেকেই প্রহসন লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রহসন স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের মতো সরস পরিহাসে পূর্ণ অনাবিল হাস্যরসের উজ্জ্বলতা খুব কম প্রহসনেই দেখা যায়।

চিরকুমার সভা (১৩৩২/১৯২৬) ঃ চন্দ্রমাধববাবু সংসারের উপকারের বাসনায় মানবপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করে স্থাপন করেছিলেন চিরকুমার সভা। কিন্তু মানব-প্রকৃতির প্রথম আঘাতেই শিষ্যত্রয় সহ স্বয়ং চন্দ্রমাধববাবুর সেই মনগড়া কাল্পনিক অবাস্তব জগৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। প্রহসনটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটিই।

চিরকুমারদের 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' কীভাবে কিশোরীদের সামান্য উদ্যোগে ভেঙে পড়ল, তার চমৎকার কৌতুককর বর্ণনায় এই প্রহসনটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

'চিরকুমার সভা'-র চন্দ্রমাধব চরিত্রটির নির্মাণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) লিখেছিলেন ঃ ''চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশেল আছে। তন্মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ-এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। ...চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে, কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোরই নাই।''

এই প্রহসনটির চরিত্রগুলি (চন্দ্রমাধববাবু, অক্ষয়, রসিক প্রভৃতি) 'চিরকুমার সভা'-র অনন্য সম্পদ। এখানে সুচতুর সংলাপ রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন ঃ '' 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। রৌদ্রালোকিত বৃষ্টিধারার ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত রুচির হাস্যরসের চিত্তাভিরাম লীলা সমস্ত গ্রন্থখানিকে অশেষ প্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। বিদগ্ধজনপ্রিয় বাক্যাবলীর চমৎকারী প্রয়োগে, উপমা রূপকের ঘটায়, যমক অনুপ্রাস-শ্লেষের ছটায় নাটকীয় কথাগুলি বিদ্যুৎ আভায় ঝলমল করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে যেন ইহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া, আমাদের অন্তর ঝাঁঝিয়া দিতেছে। 'চিরকুমার সভা'-র সর্বপ্রধান গুণ ইহার অর্থময়, ধ্বনিময় সংলাপ।'

শেষ রক্ষা (১৩৩৫)-র পূর্বের নাম ছিল 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)। ভ্রান্ত পরিচয়ের উপরেই এই প্রহসনটির মূল কাহিনি গড়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতে 'শেষ রক্ষা'-কে একটি ভ্রান্তিবিলাস প্রহসন বলা যেতে পারে।